Vol. 41 | No. 2 | 1998

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

দ্বিজ মাধব সমস্যা

Volume	41
Issue	2
Year	1998
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সাঈদ-উর-রহমান
Published online	February 1, 1998
DOI	10.62328/sp.v41i2.3
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v41i2.3
Pages	59-69
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

দ্বিজ মাধব-সমস্যা

সাঈদ-উর-রহমান*

মধ্যযুগের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ কাব্য চণ্ডীমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। ভিন্ন-ভিন্ন নামে কাব্যগুলো বিভিন্ন কবি রচনা করেছিলেন। একটি ক্ষেত্রে, তিনটি কাব্যের রচয়িতার নামের মধ্যে অনতিদূর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। তখন প্রশ্ন উঠেছে এঁদের সম্পর্ক নিয়ে। আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে সমস্যাটিকে বিস্তারিত ভাবে উপস্থাপনা করা যাক।

ক. সারদামঙ্গল/ সারদাচরিত নামের একটি চণ্ডিমঙ্গল কাব্যে ভণিতা রয়েছে মাধব, দ্বিজ মাধু, মাধবানন্দ, দ্বিজ মাধব ও দ্বিজ মাধবানন্দ এই পাঁচ নামে। এখানে লেখক একজন, কিন্তু তাঁর প্রকৃত নাম হিসাবে কোনটি গ্রহণযোগ্য? কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৫ সালে কাব্যটি শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

খ. গঙ্গামঙ্গল নামের একটি কাব্যে ভণিতা রয়েছে মাধব ও দ্বিজ মাধবের। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে কাব্যটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে।

গ. ভাগবত পুরাণের দশম স্কন্ধ ও অন্যান্য উৎস থেকে উপকরণ নিয়ে রচিত হয়েছে অনুবাদমূলক 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল'। এতে ভণিতা পাওয়া যায় মাধব, দ্বিজ মাধব, শ্রীমাধব ও মাধবাচার্যের। কাব্যটি একাধিকবার সম্পাদিত হয়েছে, তবে কোনটিই সু-সম্পাদিত নয়। আমরা ব্যবহার করেছি ১৩১০ বঙ্গাব্দের কলকাতার বঙ্গবাসী সংস্করণ।

ঘ. সতের শতকের কবি কৃষ্ণরাম দাস 'রায়মঙ্গল' কাব্য ধারার প্রথম কবি হিসেবে মাধবাচার্যের নাম করেছেন। কাব্যটি পাওয়া যায়নি। এই মাধবাচার্যের পূর্বের তিনজনের সঙ্গে সম্পর্ক আছে কিনা সে প্রশ্নও উঠেছে।

মূল বিতর্ক প্রথম তিনটি কাব্যের রচয়িতার সম্পর্ক নিয়ে। লেখকদের প্রকৃত নাম

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

কী? তিনটি কাব্য কি একজনের লেখা, না একাধিক কবির? একাধিক হলেও কয়জন? এই কবি/কবিরা আর কোন কাব্য রচনা করেছিলেন কিনা?

দুই

আলোচনার প্রথমে দেখা যেতে পারে এ বিতর্কে পূর্ববর্তী বিশিষ্ট সমালোচকেরা কে কি বলেছেন।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ একাধিক কবির অস্তিত্বে বিশ্বাসী। গঙ্গামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল লিখেছেন একজন ; শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেছেন আরেকজন। এর বাইরে বৈষ্ণব জগতে মাধবাচার্য নামে আরেকজন বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য চণ্ডীমঙ্গল ও গঙ্গামঙ্গল দুইজন ভিন্ন কবির রচনা বলে মন্তব্য করেছেন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে "চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা দ্বিজ মাধব কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা মাধব আচার্য হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন কবি।"[১] অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ও একাধিক কবির অস্তিত্বে বিশ্বাসী।[২] সুকুমার সেনও তাই মনে করতে চান। তাঁর ভাষায় —"গঙ্গামঙ্গল নিবন্ধ রচয়িতা দ্বিজ মাধব চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা অথবা কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতার সহিত অভিন্ন কিনা তা বলা দুষ্কর। ভণিতা বিচার করিলে কৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতার পক্ষেই রায় দিতে হয়।"[৩] মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস রচয়িতা আশুতোষ ভট্টাচার্যের কাছে চণ্ডীমঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতাকে 'স্বতন্ত্র ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়', তবে 'এক ব্যক্তি হওয়া অসম্ভব কিছু নহে।'[৪]

অপরদিকে তিনটি কাব্য যে একই কবির লেখা তাতে 'সংশয়ের অবকাশ অল্প' বলে সুখময় মুখোপাধ্যায়ের ধারণা[৫] : কিন্তু সন্দেহের কোন অবকাশ রাখেননি আহমদ শরীফ। তাঁর ভাষায় "ষোল শতকের কবি দ্বিজ মাধব বহুগ্রন্থ প্রণেতা। তাঁর রচিত গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলচণ্ডীর গীত) ও সারদাচরিত ও কৃষ্ণমঙ্গল প্রকাশিত

---

১. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাংলা সাহিত্যের কথা*, (ঢাকা : ১৯৬৫), পৃ. ১৯০

২. অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত*, (কলকাতা : ১৯৬৬), ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯ ও ১৮৭

৩. সুকুমার সেন, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, (কলকাতা : ১৯৭৮), ১ম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪

৪. আশুতোষ ভট্টাচার্য, *বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস*, পূর্বাধ, (কলকাতা : ১৯৭০), পৃ. ৪৬৭-৬৯

৫. সুখময় মুখোপাধ্যায়, *মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের তথ্য ও কালক্রম*, (কলিকাতা: ১৯৮৮), পৃ. ১৪৭

রচিত গঙ্গামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল (মঙ্গলচণ্ডীর গীত) ও সারদাচরিত ও কৃষ্ণমঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে।"[৬]

বিতর্ক সৃষ্টি হবার বড় কারণ হচ্ছে কাব্যে কবির ব্যক্তি পরিচয়ের অনুপস্থিতি। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সামান্য পরিচিতি আছে (সেটা প্রক্ষিপ্ত হতে পারে বলেও ধারণা আছে।) কিন্তু বাকিগুলোতে তাও নেই ; এই কারণে সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য আমাদের মনোনিবেশ করতে হবে অন্যদিকে— বিশেষ করে অভ্যন্তরীণ প্রমাণের দিকে।

তিন

প্রথমে দেখা যাক, তিনজন কবির নাম কী হতে পারে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে ছয়টি নামে ভণিতা আছে ঃ মাধু ও দ্বিজ মাধু ১ বার করে, মাধব ও মাধবানন্দ ২ বার করে, দ্বিজ মাধবানন্দ ৩৭ বার, এবং দ্বিজ মাধব ১১৮ বার। বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার কারণে দ্বিজ মাধব নামটি গ্রহণ করাই যুক্তিসংগত। বইয়ের সম্পাদকও তা গ্রহণ করেছেন।

গঙ্গামঙ্গল কাব্য ভণিতা রয়েছে মাধব ও দ্বিজ মাধবের —প্রথমটি ৩৬ বার। দ্বিতীয়টি ১১৬ বার, মাধব ভণিতা পাওয়া যায় মূলত ত্রিপদীতে, আর দ্বিজ মাধব পয়ারে। স্বল্পমাত্রার পর্বের দাবিতে ত্রিপদীতে নাম সংক্ষিপ্ত হওয়াই স্বাভাবিক। এখানেও পূর্বের যুক্তিতে দ্বিজ মাধব নাম গ্রহণ করা যায়। বইয়ের সম্পাদকও তা নিয়েছেন, তবে তাঁকে তিনি মাধবাচার্যও বলতে চান।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে ভণিতা রয়েছে মাধব, শ্রীমাধব, দ্বিজ মাধব ও মাধব আচার্যের। মাধব আচার্য ভণিতা দু জায়গায়— জায়গা দুটি ভাগবতাচার্য রচিত 'শ্রীকৃষ্ণপ্রেম তরঙ্গিনী'-র প্রক্ষিপ্ত বলে বোঝা যায়। মাধব ভণিতা রয়েছে ৮৮ বার ; আর দ্বিজ মাধব প্রায় সর্বত্র—৩০৮ বার।

এখানেও একই যুক্তিতে দ্বিজ মাধব নামটি গ্রহণ করা যায়। বঙ্গবাসী সংস্করণে কাব্যটি 'ভক্ত পণ্ডিত শ্রীমাধবাচার্য' বিরচিত বলে বলা হয়েছে।

এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, তিনটি কাব্যের লেখকের নাম দ্বিজ মাধব হিসেবে গ্রহণ করা বিধেয়।

---

৬. আহদ শরীফ, *বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা : ১৯), পৃ. ৩২৩

চার

এবারে বিবেচ্য—তিনজন দ্বিজ মাধব কি একই ব্যক্তি, না, একাধিক। এবারেও অভ্যন্তরীণ প্রমাণ অনুসন্ধান করতে হবে।

ক. গঙ্গামঙ্গল কাব্যে একটি, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দুটি ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে একটি করে তিনটি কাব্যে মোট চারটি গণেশ বন্দনা রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে শব্দব্যবহারে ও বিষয়বিন্যাসে মিল অনেক। বন্দনাগুলো পাশাপাশি রাখলেই মিল নজরে পড়ে।

গঙ্গামঙ্গল

(ধানশী রাগ)

প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন।
শুভ বুদ্ধিদায়ক বিঘ্ন বিনাশন।।
খর্ব্ব স্থূল তরল তনু লম্বিত উদর।
কুঞ্জর-সুন্দর মুখ অতি মনোহর।।
সিন্দুরে খণ্ডিত অঙ্গ অতি সুশোভন।
চারিভুজে শোভাকার অঙ্গদ কঙ্কণ।
মদগলে গণ্ডযুগে নীরদল সাজে।
দন্তে বিদারী অরি সেনাপতি রাজে।।
দেবগণের অধিপতি মুষিক বাহন।
শুভ কাজে আগে যারে করি আবাহন।।

চণ্ডীমঙ্গল : (দ্বিতীয় গণেশ বন্দনা)

ধানশী রাগ

প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন।
ভক্ত-বৎসল দেব বিঘ্ন-বিনাশন।।
মৌলি-বিকচ চারু নব হিমকর।

লম্বিত মুকুট-জটা শিবের উপর।।
মদ-গল গণ্ড, শুণ্ড এ তিন নয়ান।
মুষিক বাহন দেব, সিন্দুরে পরিধান।।
তপস্বীর বেশ, চারু লম্বিত ভুজে।
আগে আবাহন করি তোম শুভ কাজে।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল

কুঞ্জর সুন্দর মুখ এ তিন লোচন।
মদগল গণ্ডস্থল চলই সঘন।।
হিমকর রুচি এক দশন উজ্জ্বল।
স্থূল খর্ব্ব দেহভারে বিশাল উদর।
প্রণমহু গণপতি গৌরীর নন্দন।
পরম বৈষ্ণব দেব বিঘ্ন বিনাশন।।
মুষিক বাহন রক্ত চীর পরিধান।।
প্রসন্ন বাহন দেব করুণানিধান।।
লোহিত চরণ চারু নব দিনকর।।
বদন কুঞ্জর মুখ দেখিতে সুন্দর।
মৌলি মিলিত চারু নব হিমকর।
লম্বিত কুটিল জটা মুকুট উপর।।
তপস্বীর বেশেতে লম্বিত চারুভুজে।।
আগে আবাহন যারে করি শুভকাজে।

বন্দনা তিনটির আত্যন্তিক মিল থেকে এগুলি যে একজনের রচনা, তাতে সন্দেহের অবকাশ থাকে না। শব্দ ব্যবহারের ও কবির মনোভঙ্গীতে যে সামান্য

পার্থক্য দেখা যায় সেটা সম্ভবত বিভিন্ন বয়সে রচিত বলে ঘটেছে। গঙ্গামঙ্গলের 'প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন/শুভ বুদ্ধিদায়ক বিঘ্ন বিনাশন' চণ্ডীমঙ্গলে হয়েছে, 'প্রণমহো গণপতি গৌরীর নন্দন/ ভকত বৎসল দেব বিঘ্ন বিনাশন'- সর্বশেষে সেটা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে হয়েছে 'প্রণমহু গণপতি গৌরীর নন্দন/ পরম বৈষ্ণব, দেব বিঘ্ন বিনাশন।' মনে হয় গঙ্গামঙ্গল রচনার কালে কবি ছিলেন সাধারণ পঞ্চোপাসক হিন্দু; চণ্ডীমঙ্গল রচনার কালে ভক্তির গেরুয়া রং কবির মনে লেগেছিল, আর সবশেষে তিনি হয়েছিলেন পরম বৈষ্ণব। বৈষ্ণব হয়েও তিনি চণ্ডীকে ভুলেননি, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে শ্রীকৃষ্ণ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য বারবার চণ্ডীপূজা করেছিলেন।

খ. গঙ্গামঙ্গল ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের একটি ভণিতা হুবহু এক। দুই কাব্যেই এটি বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। সাদৃশ্য থেকে দুটির রচয়িতা একজন বলে গ্রহণ করা যায়। সুকুমার সেনেরও তাতে আপত্তি নেই। ভণিতাটি হচ্ছে :

১। চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।।

২। চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল
দ্বিজ মাধবে কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।।

গ. আবার বাসর গমনের দৃশ্যবর্ণনায় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের সঙ্গে মিল রয়েছে চণ্ডীমঙ্গলের। রুক্মিণী দেবীর শ্রীকৃষ্ণের বাসরে প্রবেশের দৃশ্য নিম্নরূপ :

চলিল রুক্মিণী দেবী ভাবি যদুমণি।
ভেটিবারে স্বামীবর মন্দ গামিনী।।
সহচরী করে ধরি চলিল বেহারা।।
মন্দ মঞ্জীর নাদ মদন উজারা।।

চণ্ডীকাব্যে খুলনার বাসরে গমনের দৃশ্য হচ্ছে ঃ

সহচরী করে ধরি চলে বর সুন্দরী
ভেটিবারে সাধুর নন্দন।।

দেখা যাচ্ছে গঙ্গামঙ্গল = শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, এবং শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল=চণ্ডীমঙ্গল। তাহলে অনায়াসে বলা যায় গঙ্গামঙ্গল = শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল = চণ্ডীমঙ্গল। অর্থাৎ এই তিন কাব্যের রচয়িতা একজন।।

ঘ. ভণিতা ব্যবহারের প্রকৃতিতেও তিনটি কাব্যেই এক ধরনের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি কাব্যেই বিভিন্ন ধরনের ভণিতা থাকলেও কবি একটিকে মুখ্য করে অপরগুলি গৌণ করেছেন। মুখ্য ভণিতাই বার বার ব্যবহৃত হয়।

গঙ্গামঙ্গলের মুখ্য ভণিতা :

সুনহ ভকত মন করিয়া নিশ্চল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল।।

চণ্ডীমঙ্গলে :

সারদার চরণে সরোজ মধু-লোভে।
দ্বিজ মাধবে তাই অলি হইয়া শোভে।।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে :

শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত।।

পাঁচ

ক. ব্যাকরণগত বিচারেও কাব্যগুলোর মধ্যে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। চণ্ডীকাব্যে বাংলা ভাষায় প্রায়-বিরল একটি সমষ্টিবাচক শব্দব্যবহারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য। শব্দটি হল 'ভাগে'।

১। রাজার প্রকৃতি দেখি রাণী ভাগে কান্দে।
২। রাহুত ভাগে নোঁয়ায়ে মাথা।

এই বিশিষ্ট প্রয়োগটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেও রয়েছে :

১। অবিলম্বে ডাকিয়া আনিল মন্ত্রীভাগে।
২। উদর পুরায়ে রস ভাগে।

৩। ঘৃতদধি ভেট লয়্যা লড়ে গোপভাগ।

৪। নিদ্রাইলা গোআলা ভাগ দেখি অভ্যন্তরে।

খ. আরেকটি শব্দব্যবহারে দুই কাব্যে সাদৃশ্য রয়েছে। প্রশ্নবোধক 'কেন' শব্দটি দুই কাব্যেই কেনি/ কেনে রূপে ব্যবহৃত হয়েছে।

চণ্ডীকাব্য :

১। সম্পত্তির কালে বিহা না করাইলা কেনি।

২। গহন কাননে কেনি/ ভ্রম তুহ্মি একাকিনী

৩। কি বা করি কেনে মরি কি গতি আমার।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল :

১। কেনি বা ওলাব পসার তোমার গোচর।

২। কেনি হেন মিছা কথা কহ নন্দ-সুত।

৩। আরে তুমি পরিহর কেনি।

গ. অধিকরণ কারকে 'রে' বিভক্তি আধুনিক বাংলায় মোটেই ব্যবহৃত হয়না— মধ্যযুগের বাংলায়ও এর ব্যবহার ছিল সীমিত। সামান্য ক্ষেত্রে এই বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায় আলোচ্য তিনটি কাব্যে – যা থেকে সেগুলো একই লেখকের বলে অনুমান করা যায়। উদাহরণ :

গঙ্গামঙ্গল : দেশেরে আইলা রাজা পরম তপস্বী ; খরতর স্রোত বহে তাহার গর্ভরে।

চণ্ডীমঙ্গল : ভোগ ভুঞ্জিয়া রাজা গেল কৈলাশেরে ; কথাকারে গেল আহ্মার সঙ্গিনী তনয়।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : যাই মথুরারে ; যাহ কোথাকারে ; স্বর্গেরে চলিল পক্ষ শরীর তেজিয়া।

ঘ. অব্যয় বাচক 'ত'-এর দেদার ব্যবহার কাব্য তিনটির আরেক বিশিষ্টতা।

গঙ্গামঙ্গল : সেই ত ভুবন ; হাসিয়া ত ভগবান ; তুমি ত সকল রসময় ; পাইয়া ত দ্রবনিধি ; আপনি ত ইন্দ্র ; সহিয়া ত যুঝে।

চণ্ডীমঙ্গল : দুই ত যুবতী ; হইয়া ত তরঙ্গিনী ; ভ্রমিয়া ত বাড়ী বাড়ী ; করিয়া ত নানাবেশ ; দিবা ত আপনি ; দুর্বলা ত দাসী।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল : বচনে ত হরষিত ; কৌতুকে ত উচ্চস্বরে ; লঙ্ঘিবারে ত পাতিল ; হেনই সময়ে ত ; পড়িয়াছে ত আপনি, তর্জ্জিয়া ত যায়।

এভাবে গণেশ বন্দনার সাদৃশ্য, ভণিতা ব্যবহারে বিশিষ্টতা এবং শব্দব্যবহারে-ব্যাকরণে মিল বিচার করে দেখলে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে, তিনটি কাব্য একজনেরই রচনা। তাঁর নাম যে দ্বিজ মাধব বলে গ্রহণই যুক্তিযুক্ত, তা শুরুতেই বলা হয়েছে। এই কবি চৈতন্যভক্ত ছিলেন।

ছয়

এ প্রসঙ্গে আরো দুটি বিষয় আলোচনা করা দরকার। চণ্ডীকাব্যে 'মাধবানন্দ' নাম ব্যবহারের তাৎপর্য, এবং একই কবির পক্ষে শাক্ত কাব্য ও বৈষ্ণব কাব্য রচনা করা সম্ভব কিনা? এ বিষয়ে পাথুরে প্রমাণের অভাবে অনুমানের আশ্রয় নিতে হয়।

সাহিত্যবিশারদ চণ্ডীমঙ্গলকে কবির প্রথম রচনা বলে মনে করেন। শৈল্পিক ক্রমোন্নতি বিচার করে কিন্তু গঙ্গামঙ্গল একেবারে গোড়াতে স্থাপন করতে হয়। কবির শিল্পজ্ঞান তখনো প্রখর হয়নি। ছন্দে শিথিলতা, বর্ণনায় ভাবালুতা ও পুনরুক্তি এই কাব্যে নজরে পড়ে। তার তুলনায় চণ্ডীকাব্য ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল উন্নততর পর্যায়ের।

চণ্ডীকাব্য রচনা সমাপ্ত হয়েছিল ১৫৭৯ সালে। ১৫৮০ সালের পরে কোন এক সময়ে রাজশাহী জেলার খেতুরী গ্রামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বৈষ্ণবদের মহাসম্মেলন। মাধব তাতে যোগ দিয়েছিলেন।[৭] অনুমান করা যায় চণ্ডীকাব্য রচনার সময় তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা নিয়ে বৈষ্ণবীয় নাম 'মাধবানন্দ' গ্রহণ করেছিলেন। তখনো চণ্ডীকাব্য রচনা চলছিল বলে তাতে মাধবানন্দের ভণিতা পাওয়া যায়। খেতুরীর উৎসবের পর সাধক কবি হিসেবে বৈষ্ণব সমাজে তিনি সম্মানের উঁচু আসনে অধিষ্ঠিত হন ও মাধবাচার্য নামে সম্বোধিত হন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল সে পর্যায়ের রচনা।

যিনি শক্তিদেবী চণ্ডী নিয়ে কাব্য রচনা করেন, তিনি প্রেমের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ নিয়ে কাব্য রচনা করতে পারেন কিনা, সেই প্রশ্নটি 'বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস' গ্রন্থে আশুতোষ ভট্টাচার্য দৃষ্টান্ত সহকারে আলোচনা করে ইতিবাচক সিদ্ধান্তে উপনীত

---

৭. *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস*, পৃ: ৩৩৪

হয়েছেন। বড়ু চণ্ডীদাস বাসুলীসেবক বা পূজক হয়েও রচনা করেছিলেন রাধা-কৃষ্ণ লীলা। বাঙালী চিরকাল পঞ্চোপাসক, এককদেবতা নিষ্ঠ নয়। আরো দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেও কবি চণ্ডীদেবীকে একেবারে পরিত্যাগ করেননি। কৃষ্ণকে পতি হিসেবে লাভ করার জন্য রুক্মিনীদেবী চণ্ডিকা পূজা করেছিলেন এবং সফলও হয়েছিলেন।

এইরূপে রাজকন্যা পদ বিহরণে
আসিয়া মিলিল সেই অম্বিকা ভবণে।
হস্তপদ পাখালিয়া কৈলা আচমন।
গৃহে প্রবেশিয়া করি চণ্ডী দরশন।।
প্রণাম করিয়া তবে মাগিলেন বর।
স্বামি করি দেহ মোরে দেব গদাধর।।

কৃষ্ণ বাল্যকালে যাদের আশ্রয়ে লালিত-পালিত হয়েছিলেন, সেই গোয়ালারাও চণ্ডীদেবীর পূজা করছে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যে। এভাবে দেখা যায়, দ্বিজ মাধবের চেতনায় হরির প্রতি এবং হরপত্নীর প্রতি শ্রদ্ধাবোধে কোন ফারাক ছিল না।

সাত

এই তিনটি বাদে দ্বিজ মাধব আর কোন কাব্য রচনা করেছিলেন কিনা, এবারে সেই প্রশ্ন আসে। সতের শতকের কলকাতা পরগণার নিমিতা গ্রামের কবি কৃষ্ণরাম দাস রায়মঙ্গল কাব্যের শুরুতে (রচনাকাল ১৬৮৬) পূর্ববতী রচয়িতা হিসেবে মাধব আচার্যের নামোল্লেখ করেছিলেন :

পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।
না লাগে আমার মনে তাহে নাহি কার্য্য।।
মশান নাহিক তাহে শুধু খেলে পাশা।
চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা।।
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়েন।
অন্য গীত ফিরাইয়া গায়ে জাগরণ।।

দক্ষিণ রায়ের জবানীতে কৃষ্ণরাম দাস এখানে বলেছেন যে, তার পূর্বে মাধব আচার্য রায়মঙ্গল বিষয়ক কাব্য লিখেছিলেন, কিন্তু সেটা দক্ষিণ রায়ের মনঃপূত হয়নি। সাধারণ লোকেরাও সেটা ভুলে গিয়ে 'জাগরণ' গীত করত। এই জাগরণ বলে কবি কিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? মঙ্গলকাব্য সাহিত্যে জাগরণ সুপরিচিত হলেও দ্বিজ মাধবের চণ্ডীমঙ্গলই 'জাগরণ' নামে বিশেষভাবে পরিচিত। (গঙ্গামঙ্গলের ভূমিকা) আমাদের মনে হয়, কৃষ্ণরাম দাস এখানে দ্বিজ মাধবের চণ্ডীকাব্যের প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। তাহলে, দ্বিজ মাধব ওরফে মাধবাচার্য 'রায়মঙ্গল' নামে চতুর্থ একটি কাব্য রচনা করেছিলেন। সেটা বিলুপ্ত হয়ে শুধু নামে টিকে আছে কৃষ্ণরাম দাসের রচনায়, যেমন করে হরিদত্তের মনসামঙ্গল টিকে আছে বিজয়গুপ্তের উদ্ধৃতিতে।

আট

দ্বিজ মাধবের ব্যক্তিপরিচিতি সম্পর্কে বিভিন্ন কাব্য থেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাপ্ত তথ্য থেকে মোটামুটি ধারণা লাভ করা যায়। তিনি ষোল শতকের শেষার্ধে জীবিত ছিলেন। তিনি রাঢ় অঞ্চল তথা পশ্চিম বাংলার নদীয়ার অধিবাসী ছিলেন – তবে দীর্ঘকাল বাস করেছিলেন বৃহত্তর চট্টগ্রাম জেলায়। সেটা কর্মসূত্রে হতে পারে-অথবা জন্মভূমি ত্যাগ করে পূর্ববাংলায় চলে এসেছিলেন তেমন হওয়াও বিচিত্র নয়। পনের শতকের মনসামঙ্গলের খ্যাতনামা কবি নারায়ণদেবও রাঢ় ত্যাগ করে ময়মনসিংহে বসতি স্থাপন করেছিলেন। মাধবের পিতা বা অগ্রজের নাম ছিল পরাশর। পরাশর বিদ্যায়, দানে, ধ্যানে বিখ্যাত ছিলেন। কবিরও সংস্কৃত ভাষা-সাহিত্যে ও জ্যোতিষ শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে স্পষ্ট সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব নয়। সম্ভবত প্রথম জীবনে ছিলেন শাক্ত, পরে হয়েছিলেন বৈষ্ণব।